অন্য বাংলাদেশের উত্থানপর্ব

বিনায়ক সেন

অর্থনীতি

১.

উন্নয়নের মানদণ্ড কী এ নিয়ে আমাদের সমাজে বহুকাল ধরে বিতর্ক চলে আসছে। মহাভারতের একটি নাটকীয় মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরকে যক্ষ যখন প্রশ্ন করলেন, 'সুখী কে?', তার উত্তরে তিনি সোজাসাপটা উত্তর দিয়েছিলেন : 'যিনি ঋণশূন্য ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে আপন গৃহে শাকান্ন ভোজন করেন, তিনিই সুখী।' প্রাথমিক পণ্য-প্রয়োজন মিটিয়ে বেঁচে থাকা– উন্নয়নের এই সরলতম সংজ্ঞার পেছনে মূল কারণ ছিল অন্যত্র। প্রাচীন সমাজ থেকেই এ দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য চলে আসছিল বেশ ব্যাপক আকারেই। পণ্ডিত কোসাম্বী মনে করেছেন যে, তৈত্তেরীয় সংহিতার যুগে যাগযজ্ঞের প্রাবল্য ও দান-দক্ষিণায় খাদ্যদ্রব্যের নানা আয়োজনের মূলে ছিল সমাজে পরিব্যাপ্ত ক্ষুধা ও খাদ্যাভাব। তাই বহুসংখ্যক দেবতার কাছে খাদ্যের জন্য বারংবার এত করুণ আকুতি ও নানা ভাষায় এত প্রার্থনা। সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'যেন খেতে পাই'– এ প্রার্থনাটা ছড়িয়ে আছে সারা বৈদিক সাহিত্যে। ঋগ্বেদে ক্ষুধার তীব্র এক চিত্র পাই ব্রাহ্মণ বামদেব ঋষির বয়ানে। তিনি বলছেন, 'অভাবের জন্য আমি কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেয়েছি; দেবতাদের মধ্যেও কোনো সাহায্যকারী পাইনি, স্ত্রীকে অপমানিত হতে দেখেছি। পরে এক শ্যেন আমার জন্য মধু আহরণ করে।' চণ্ডালের খাদ্য কুকুরের মাংসও যেখানে জোটে না, শেষ পর্যন্ত কোনো বাজপাখির সঞ্চয় থেকে মধু খেয়ে প্রাণরক্ষা করতে হয়, এমনই নিদারুণ পরিস্থিতি সময় সময় দেখা দিত সেকালে। তবে উন্নয়ন বলতে শুধু খেয়ে-পরে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকা এরকম সরল সংজ্ঞার বাইরেও অন্য

বাকি অংশ ৫০-এর পৃষ্ঠায়

বিনায়ক সেন

অন্য বাংলাদেশের উত্থান

৪৯-পৃষ্ঠার পর

অন্বেষণা ছিল। যুধিষ্ঠিরকে যক্ষ যখন প্রশ্ন করেছিলেন, 'মৃত পুরুষ কে? মৃত রাষ্ট্র কি?' তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'দরিদ্র পুরুষই মৃত। অরাজক রাষ্ট্রই মৃত রাষ্ট্র।' এভাবে খাদ্যাভাবের পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতা ও জীবনচর্চার অন্যান্য মাত্রা উন্নয়নের ধারণায় উঠে আসছিল। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন তার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে নানাবিধ সম্পদ দানের ইচ্ছা জানালেন, মৈত্রেয়ী তখন বলেছিলেন, 'যা আমাকে অমরত্ব দেবে না, তা দিয়ে আমি কী করব?' অর্থাৎ বৈষয়িক সম্পদ যদি শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর কিছু লক্ষ্যের দিকে না নিয়ে যেতে পারে তাহলে তার মানবিক মূল্য কোথায়? এরিস্টটলের নীতিশাস্ত্রেও দেখতে পাই, শুধু বিত্তবাসনায় পরিতৃপ্তি নেই, মহত্তর কোনো অর্জনের মধ্যেই মানুষের শ্রেয়োতর পরিণতি। অমর্ত্য সেনের দার্শনিক বিচার এভাবেই উন্নয়নের সংজ্ঞাকে উপযোগিতাবাদ থেকে সম্প্রসারিত করেছে সামর্থ্যবাদে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও উন্নয়ন কোন পথে চলছে তাকে খুঁজতে গেলে শুধু আয়-প্রবৃদ্ধি বা আয়-দারিদ্র্য নয়, উন্নয়নের বহুমাত্রিক ও বহুবাচনিক ধারণার বলয়েই খুঁজে নিতে হবে।

২.

'কত দূর এগোলো বাংলাদেশ'– এরকম একটি প্রশ্নের উত্তরে খুলনা বিভাগের রূপসা থানার একজন রিকশাচালক ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে আমাদের যা জানিয়েছিলেন তার নিহিতার্থ আমরা অনেকটা এভাবে বুঝেছিলাম। আমাদের জীবনে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে ঠিকই কিন্তু তা বেশ কিছু নেতিবাচক পরিবর্তনে সমানভাবে আকীর্ণ। বলা যায়, ইতি ও নেতি এক নাজুক ভারসাম্য রচনা করছে আমাদের জীবনে। উন্নয়নের মূল চ্যালেঞ্জগুলো কোথায় এ নিয়ে শ্রমজীবী মানুষেরা কী মনে করছেন, এরকম একটি 'অংশীদারিত্বমূলক' সভায় উক্ত রিকশাচালক প্রতিনিধি ভালো দিকের ও মন্দ দিকের 'ভারসাম্য' বলতে (তিনি প্রকৃতপক্ষে 'ব্যালেন্স হয়ে আছে' এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন) কী বুঝিয়েছিলেন তা নিয়ে পরে আমরা নিজেদের মধ্যে বেশ কিছুটা আলোচনা করি। তিনি বলতে চাননি- যেমনটা বাংলাদেশকে ভাবতে গিয়ে অনেকে করে থাকেন- একই সঙ্গে গেলাসের 'অর্ধেক পূর্ণ' (আশার দিক) এবং গেলাসের 'অর্ধেক ফাঁকা' (হতাশার দিক)। বিষয়টা ঠিক ইতি ও নেতির অঙ্ক কষায় নিট যোগফল বের করার মতো নয়। সেরকম যোগফল করাও কঠিন। কেননা আমাদের জীবনের যেসব দিকে 'ইতিবাচক পরিবর্তন' হচ্ছে তার থেকে জীবনের অন্যান্য যেসব দিকে 'নেতিবাচক পরিবর্তন' হচ্ছে তা চাইলেই যোগ-বিয়োগ করা যায় না। আয়ের বিচারে আমার প্রকৃত আয় বাড়ল ঠিকই, কিন্তু নিরাপত্তাহীনতার বিচারে আমার অধোগতি হলো- উন্নয়নের এই দুই মাত্রার মধ্যে যোগ-বিয়োগ করা সহজসাধ্য নয়। রিকশাচালকের ভাষ্যে অগ্রগতি ও অধোগতি আমাদের জীবনে এক নাজুক ভারসাম্য তৈরি করেছে সে কথায় বরং আমরা সমাজ-রূপান্তরের বর্তমান পর্যায়ের একটি কুলক্ষণ খুঁজে পেয়েছিলাম। 'আগে বাংলাদেশকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমরা কেবল অর্ধেক গেলাস ফাঁকা সেই গল্পই বেশি করে বলেছি। এবারে অর্ধেক গেলাস পূর্ণ সেই কথাটা জোরেশোরে বলতে চাই- বৈদেশিক দাতাদের অনেককেই এমনটা আজকাল বলতে শুনি। কিন্তু আমার মনে হয় বিষয়টা কেবল দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের-দৃষ্টিবদলের ব্যাপার নয়। বাংলাদেশ আসলেই উন্নতি করেছে গত পনেরো বছরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সূচকে। আবার দেশটির আসলেও অবউন্নয়ন ঘটেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচকে। দুটোই সমান মাত্রায় সমান তালে চলছে– এমন একটি বিচারই বিধৃত ছিল রূপসা থানার রিকশাচালক বন্ধুটির কথায়। একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

৩.

গত তিন বছর ধরে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতি সম্পর্কিত ধারণা-সূচকে জরিপকৃত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে, এটি সাম্প্রতিককালের বহুল আলোচিত একটি বিষয়। জরিপের বাইরে অবশ্য উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশই এখনো রয়ে গেছে। সেহেতু 'বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ' হচ্ছে বাংলাদেশ, এই মর্মে যা কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, তা বেশ বাড়িয়ে বলার মতোই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া দুর্নীতি সম্পর্কে ধারণা সূচকে নিচের দিক থেকে দশ বা পনেরোর মধ্যে রয়েছে এমন অনেক দেশ যারা আবার অন্যদিক থেকে বৈদেশিক দাতাগোষ্ঠীর প্রশংসাভাজন (যেমন, উগান্ডা) অথবা বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় স্থল (যেমন, ভারত)। পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ (ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড তো বটেই, কোরিয়া-জাপানও ব্যত্যয় নয়) প্রবৃদ্ধির বিচারে দ্রুত আগুয়ান হলেও স্বজনপ্রীতি, গোষ্ঠীতন্ত্র ও দুর্নীতি-সম্পর্কিত অখ্যাতি কম কুড়োয়নি। আর দক্ষিণ এশিয়ায় দুর্নীতির এক দীর্ঘ সামাজিক ইতিহাস রয়ে গেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রর একটি বড় অংশজুড়ে আছে দুর্নীতি বিষয়ে রাষ্ট্রতন্ত্রকে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। দুর্নীতি আমাদের দেশে শুধু রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা বা অর্থনৈতিক প্রশাসন বলয়ের সমস্যা নয়, এটি একটি সামাজিক সমস্যাও। একে শুধু পলিসির সমস্যা হিসেবে দেখলে চলবে না। কোনো সন্দেহ নেই যে, দুর্নীতির সর্বগ্রাসী [illegible]

একটি বড় অংশ গরিবদের কাছে পৌছায় না। এই সবই সত্য। কিন্তু বিষয়টি সহসা সমাধা হবার মতো নয়।

যে সময়ে বাংলাদেশের দুর্নীতি-সূচক নিয়ে আলোচনা চলছে, ঠিক সে সময়েই এ দেশেরই অন্য আরেকটি অর্জন প্রায় আমাদের দৃষ্টির অলক্ষ্যে থেকে গেল। এই প্রথমবারের মতো ইউএনডিপির বিশ্ব-তালিকায় মানব-উন্নয়ন সূচকের নিরিখে বাংলাদেশ নিম্ন মানব-উন্নয়নের গ্রুপ থেকে মাঝারি মানব-উন্নয়নের গ্রুপে উন্নীত হয়েছে। এই মাঝারি মানব-উন্নয়নের গ্রুপে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে স্থান পেয়েছে মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ভারত ও ভুটান। আর নিম্ন মানব-উন্নয়নের গ্রুপে এখনো রয়ে গেছে পাকিস্তান ও নেপাল। বস্তুতপক্ষে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নব্বই দশকে মানব-উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে গড় বাৎসরিক অগ্রগতির হার ছিল বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ। নিম্ন মানব-উন্নয়নের স্তর থেকে মাঝারি মানব-উন্নয়নের স্তরে বাংলাদেশের এই উত্তরণ সজোরে চেঁচিয়ে বলার মতোই সাফল্য। বস্তুত এই উত্তরণের পেছনে রয়েছে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন : শিশুমৃত্যুর হারে তাৎপর্যপূর্ণ হ্রাস, প্রজনন হারের কমে আসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলগামিতা বৃদ্ধি, বিশেষত নারীশিক্ষার প্রসার, শিশুপুষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন, খাদ্যশস্য উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসা, বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলার সামর্থ্য, সামরিকতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে শত দুর্বলতা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের পথ বেয়ে চলা। এই তালিকার আরো সম্প্রসারণ সম্ভব। কিন্তু এখানে যেটা লক্ষ করার তা হলো জীবনের মন্দ দিকের পাশাপাশি এর ভালো দিকগুলোও বাংলাদেশকে শেষাবধি স্পর্শ করেছে। এক সময় যে দেশকে মারী ও মড়ক, বন্যা ও দুর্বিপাক, দুর্ভিক্ষ ও সামাজিক অস্থিরতার ক্লাসিক সমাবেশ হিসেবে দেখা হতো, আজ সে দেশেরই ভাবমূর্তি যাচ্ছে বদলে। কী ঘরে, কী বাইরে। বাইরে যতটা বেশি, ঘরে এখনো ততটা নয়। আমরা কি কখনো ভাবতে পেরেছি আমাদের জীবদ্দশায়, প্রায় এক প্রজন্মের ভেতরে বাংলাদেশ এভাবে উঠে দাঁড়াবে, বিশ্বতালে তাল রেখে চলতে শিখবে? এক কথায়, ভালো-মন্দ নিয়েই দেশের জীবন : শুধু মন্দটা দেখতে গিয়ে ভালোর দিকটাকে যেন আমরা ভুলে না যাই। কেননা কেবল যা অর্জনের দিক তাকে ধরে রাখতে পারলেই যেসব দিকে ব্যর্থতা তাতে সফলতা পাওয়া সম্ভব।

৪.

তারপরও এখনো হতাশার সুরই আমাদের জীবনের প্রবলতম সুর। কোনো গূঢ় ভৌগোলিক ও সামাজিক কারণে আত্যন্তিকভাবেই বাঙালির মনন বিষম সংশয়ী, প্রগতির সম্ভাবনায় নাস্তিবাদী, ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিয়তিনির্ভর, রাষ্ট্র-সংগঠনে আস্থাহীন, অস্থির ও অভিবাসী এবং প্রায়শ আত্ম-অনুকম্পাপ্রবণ। হয়তো এতেই আমাদের চিন্তার বিশিষ্টতা– সবচেয়ে খারাপ পরিণতির কথা ভেবেই আমরা যাত্রা শুরু করে থাকি। সম্ভাবনার সবচেয়ে ঋণাত্মক পরিণতি থেকেই বিচারে প্রবৃত্ত হই। হয়তো এভাবেই আমরা আশার আলো জ্বালিয়ে রাখি। তাই সব গেল সব গেল বলে কত বার রব উঠলেও শেষ পর্যন্ত ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে আজ এই অবধি আমাদের পৌছানো।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ মননচর্চায় কত ভাবেই বাঙালির ভবিষ্যৎ নিয়ে বিলাপের ধ্বনি উঠেছে। রেনেসাঁর প্রবলতম সুর ছিল বিলাপের– 'কিছুই তো হলো না' এই নিয়ে। আমরা কি কখনো 'তাদের' মতো করে দাঁড়াতে পারব, যারা আমাদের সাত সমুদ্দর তেরো নদীর পার থেকে 'শিক্ষা দিতে' এসেছে? সেই সঙ্গে অবশ্য ছিল 'হারানো গৌরব'-এর জন্য হতাশ্বাস। বঙ্কিম আক্ষেপ করে লিখেছেন, আমাদের কেন 'ইতিহাস' নেই, যেমনটা আছে যুরোপের। আমাদের সবাইকে 'ইতিহাস লেখার' জন্য সচেষ্ট হতে বলেছেন, নইলে ওরা যে আমাদের ছোট করে দেখছে। ওরা যে ভাবছে আমরা লেখা-পড়াহীন বে-ইতিহাস জাতি। য়ুরোপ-কেন্দ্রিকতা চরমে উঠেছিল বঙ্কিমের চিন্তাধারায়। 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যায় লৌকিক উন্নতি পৃথিবীতে কখন হয় নাই বা হইবে এমত ভরসা পূর্বগামী মনুষ্যেরা কখন করেন নাই।' একই প্রবন্ধে লিখেছেন, 'স্ত্রী-পুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য ইংরাজ-বাঙালিতেও সেইরূপ। ইংরাজ বলবান, বাঙালি দুর্বল; ইংরাজ সাহসী, বাঙালি ভীরু; ইংরাজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙালি কোমল।' আরো লিখেছেন যে, 'কোন একজন ইংরাজ অপেক্ষা কোন একজন বাঙালিকে শ্রেষ্ঠ দেখা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণ ইংরাজ যে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ইংরাজরা আমাদের অপেক্ষায় বলে, সভ্যতায়, জ্ঞানে এবং গৌরবে শ্রেষ্ঠ।' এভাবেই বাঙালি হয়ে ওঠে এক বন্ধ্যা ও ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার প্রতীক। এরকম আক্ষেপ উনিশ-বিশ শতকের আরো অনেক শ্রেষ্ঠ রচনায় বেজে উঠেছে। বঙ্কিম-ভূদেবের আক্ষেপ শেষ পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছে [illegible]

তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ অর্জন ও ব্যর্থতা নিয়ে। 'আমরা [illegible]
হতে পারব?'– ইতিহাস নিয়ে আমাদের [illegible]
সংকীর্ণতাবোধের জন্ম ও হীনম্মন্যতার [illegible]
শতকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি [illegible]
সংকটও এখানে: কখনো য়ুরোপ, কখনো [illegible]
অন্যের নিরিখে নিজেকে বিচার করে চলেছি। [illegible]
উন্নয়ন 'ঘটাতে' চেয়েছি। কখনো নিজস্ব [illegible]

৫.

অন্য বাংলাদেশের উত্থানপর্ব নিয়ে লিখতে গিয়ে [illegible]
আসতেই হলো। তার কারণ অন্যত্র। আমাদের [illegible]
যথোপযুক্ত সম্মান জানাতে আমরা এখনো [illegible]
ভুল ভেবেছেন অনেক সময়ই সেটা বুঝতে [illegible]
নিজেদের বিদেশী অনুকম্পার চোখেই [illegible]
বিদেশীদের রচিত উন্নয়ন ভাবনার একটা [illegible]
ধরনের অর্থনৈতিক ওরিয়েন্টালিজম। [illegible]
গ্রন্থের মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন প্রাচ্য [illegible]
বিষয়ে পরিণত হয়, কখনো এর ঐতিহ্য [illegible]
নিয়ে, গুজব ছড়ানোর মধ্য দিয়ে, কখনো এর [illegible]
নেতিকরণের মধ্য দিয়ে। এর ফলে [illegible]
আবশ্যিকভাবেই নির্ভর হয়ে পড়ে পাশ্চাত্যের [illegible]
ওপর, কেননা পাশ্চাত্যের উদ্ভাবিত [illegible]
ক্ষমতা তো আমাদের নেই। আমরা [illegible]
ও এগোতে অক্ষম। এখানেই আমাদের [illegible]
অঙ্গীকার হয়ে দাঁড়ায় এক ধরনের [illegible]
বলা হয়েছে 'হোয়াইট ম্যান'স বার্ডেন')। [illegible]
পাশ্চাত্য ভাষণে আত্মসমর্পণ করে বসে আছি।

নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন সত্তা হয়ে আমরা [illegible]
পাশ্চাত্যের সঙ্গেও ফলপ্রসূ একটি [illegible]
অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের নামে [illegible]
যেমন ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির [illegible]
না নিতে চাওয়ার প্রস্তাবও হবে আমাদের জন্য [illegible]
(স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, [illegible]
সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার মনে করতেন)। আমরা [illegible]
চাই না– 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' [illegible]
তুলতে চাই। উদারীকরণের খোলা হাওয়া [illegible]
হওয়ার আমাদের মানসিকতাকে [illegible]
অবশ্য আমরা চাই অন্য উদারীকরণ, [illegible]
আমাদের জন্য নয়– এ কথা [illegible]
রডরিক, পল ক্রুগম্যান থেকে শুরু করে [illegible]
আগে ষাটের দশকে আমাদের উন্নয়ন-অর্থনীতিবিদ [illegible]
উন্নয়ন মডেলের স্রষ্টা 'হার্ভার্ড গ্রুপের' [illegible]
নূরুল ইসলাম, রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান [illegible]
ভাবেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। [illegible]
রজ্জু বেয়ে প্রায়োগিক উপযোগিতা যাচাই [illegible]
আমাদের জন্য শ্রেয়োতর পন্থা। আমরা [illegible]
এড়িয়ে চলতে চাই না, আর তথাকথিত [illegible]
নিক্ষিপ্ত হতে চাই না। আমরা অর্থনীতির [illegible]
ভাবাদর্শ নয়, প্রায়োগিক উপযোগিতা [illegible]
দায়দায়িত্বের অনুজ্ঞাচালিত হয়ে নীতিগত [illegible]
এক্ষেত্রে অনেকেই আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত, [illegible]
ভিয়েতনাম খুব বেশি শিক্ষণীয় উদাহরণ বলে [illegible]
কীভাবে প্রায়োগিক উপযোগিতা বিচার করে অর্থনৈতিক [illegible]
অগ্রসর হওয়া যায়, গত দুই দশকের চীন তার প্রমাণ। [illegible]
ও সরকারি হস্তক্ষেপ, ব্যক্তি খাত, রাষ্ট্রায়ত্ত খাত [illegible]
ব্যক্তিস্বার্থ ও পরার্থপরতা, বিশ্বায়ন ও [illegible]
বিকেন্দ্রীভবন, ম্যাক্রো ও মাইক্রো, দেশীয় ও [illegible]
আঞ্চলিক) অর্থশাস্ত্রের যতগুলো প্রয়োজনীয় [illegible]
ট্রায়ালিটি রয়েছে এর প্রতিটিতেই কোনো পূর্বনির্ধারিত [illegible]
প্রায়োগিক বিবেচনা ও সামাজিক দায়দায়িত্ববোধ [illegible]
উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। এখানে অবশ্য এ [illegible]
যোগ করা দরকার– সামাজিক দায়দায়িত্ববোধ [illegible]
[illegible]

বাংলাদেশের উত্থানপর্ব

৪৯-পৃষ্ঠার পর

... কাছে পৌছায় না। এই সবই সত্য। কিন্তু ... মতো নয়।

... দুর্নীতি-সূচক নিয়ে আলোচনা চলছে, ঠিক ... আরেকটি অর্জন প্রায় আমাদের দৃষ্টির ... এই প্রথমবারের মতো ইউএনডিপির বিশ্ব-... সূচকের নিরিখে বাংলাদেশ নিম্ন মানব-... মাঝারি মানব-উন্নয়নের গ্রুপে উন্নীত হয়েছে। এই ... গ্রুপে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে স্থান পেয়েছে ... ও ভুটান। আর নিম্ন মানব-উন্নয়নের গ্রুপে ... ও নেপাল। বস্তুতপক্ষে, দক্ষিণ এশিয়ার ... দশকে মানব-উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে গড় ... ছিল বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ। নিম্ন মানব-... মাঝারি মানব-উন্নয়নের স্তরে বাংলাদেশের এই ... বলার মতোই সাফল্য। বস্তুত এই উত্তরণের ... ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন : শিশুমৃত্যুর ... হারের কমে আসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ... বিশেষত নারীশিক্ষার প্রসার, শিশুপুষ্টির ক্ষেত্রে ... উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, দুর্ভিক্ষের ... আসা, বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলার ... প্রত্যাখ্যান করে শত দুর্বলতা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের ... আরো সম্প্রসারণ সম্ভব। কিন্তু এখানে ... জীবনের মন্দ দিকের পাশাপাশি এর ভালো ... শেষাবধি স্পর্শ করেছে। এক সময় যে ... ও দুর্বিপাক, দুর্ভিক্ষ ও সামাজিক অস্থিরতার ... দেখা হতো, আজ সে দেশেরই ভাবমূর্তি যাচ্ছে ...। বাইরে যতটা বেশি, ঘরে এখনো ততটা ... ভাবতে পেরেছি আমাদের জীবদ্দশায়, প্রায় এক ... এভাবে উঠে দাঁড়াবে, বিশ্বতালে তাল রেখে ... ভালো-মন্দ নিয়েই দেশের জীবন : শুধু ... দিকটাকে যেন আমরা ভুলে না যাই। ... দিক তাকে ধরে রাখতে পারলেই যেসব দিকে ... পাওয়া সম্ভব।

... সুরই আমাদের জীবনের প্রবলতম সুর। ... ও সামাজিক কারণে আত্যন্তিকভাবেই বাঙালির ... সম্ভাবনায় নাস্তিবাদী, ভবিষ্যৎ বিষয়ে ... আস্থাহীন, অস্থির ও অভিবাসী এবং প্রায়শ ... এতেই আমাদের চিন্তার বিশিষ্টতা– ... কথা ভেবেই আমরা যাত্রা শুরু করে থাকি। ... পরিণতি থেকেই বিচারে প্রবৃত্ত হই। হয়তো ... আলো জ্বালিয়ে রাখি। তাই সব গেল সব গেল ... শেষ পর্যন্ত ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে ... পৌঁছানো।

... কত ভাবেই বাঙালির ভবিষ্যৎ নিয়ে ... রেনেসাঁর প্রবলতম সুর ছিল বিলাপের– 'কিছুই ...। আমরা কি কখনো 'তাদের' মতো করে ... আমাদের সাত সমুদ্দর তেরো নদীর পার থেকে ... সঙ্গে অবশ্য ছিল 'হারানো গৌরব'-এর জন্য ... করে লিখেছেন, আমাদের কেন 'ইতিহাস' ...। আমাদের সবাইকে 'ইতিহাস লেখার' ..., নইলে ওরা যে আমাদের ছোট করে দেখছে। ... লেখা-পড়াহীন বে-ইতিহাস জাতি। য়ুরোপ-... বঙ্কিমের চিন্তাধারায়। 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি ... ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যায় লৌকিক উন্নতি ... বা হইবে এমত ভরসা পূর্বগামী মনুষ্যেরা কখন ... লিখেছেন, 'স্ত্রী-পুরুষে যেরূপ স্বভাবগত ... সেইরূপ। ইংরাজ বলবান, বাঙালি দুর্বল; ... ভীরু; ইংরাজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙালি কোমল।' ... একজন ইংরাজ অপেক্ষা কোন একজন ... হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ ইংরাজ যে শ্রেষ্ঠ ... ইংরাজেরা আমাদের অপেক্ষায় বলে, সভ্যতায়, ...। এভাবেই বাঙালি হয়ে ওঠে এক বন্ধ্যা ও ... একরকম আক্ষেপ উনিশ-বিশ শতকের আরো ... উঠেছে। বঙ্কিম-ভূদেবের আক্ষেপ শেষ পর্যন্ত ... হোসেন-আক্রাম খাঁ-আবুল মনসুর ... শতকের 'হিন্দু বাঙালি' রেনেসাঁকে ... [illegible]

তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ অর্জন ও ব্যর্থতা নিয়ে। 'আমরা কি কখনো ওদের মত হতে পারব?'– ইতিহাস নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনার সূত্রপাত, সংকীর্ণতাবোধের জন্ম ও হীনম্মন্যতার উৎস এই প্রশ্নেই। উনিশ-বিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু-মুসলিম রেনেসাঁর সংকটও এখানে: কখনো য়ুরোপ, কখনো মধ্যপ্রাচ্য, কখনো ভারতবর্ষ– অন্যের নিরিখে নিজেকে বিচার করে চলেছি। অন্যকে অনুকরণ করে উন্নয়ন 'ঘটাতে' চেয়েছি। কখনো নিজস্ব ভূ-ভাগে দাঁড়াতে চাইনি।

৫.

অন্য বাংলাদেশের উত্থানপর্ব নিয়ে লিখতে গিয়ে এটুকু মানসিক বৃত্ত ঘুরে আসতেই হলো। তার কারণ অন্যত্র। আমাদের শ্রেয়োতর অর্জনসমূহকে যথোপযুক্ত সম্মান জানাতে আমরা এখনো শিখিনি। বিদেশীরা আমাদের ভুল ভেবেছেন অনেক সময়ই সেটা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আমরাও নিজেদের বিদেশী অনুকম্পার চোখেই বিচার করেছি। বাংলাদেশ নিয়ে বিদেশীদের রচিত উন্নয়ন ভাষ্যের একটা বড় অংশজুড়ে রয়েছে এক ধরনের অর্থনৈতিক ওরিয়েন্টালিজম। এডওয়ার্ড সাঈদ 'ওরিয়েন্টালিজম' গ্রন্থের মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন প্রাচ্য কীভাবে পাশ্চাত্যের জ্ঞানকাণ্ডের বিষয়ে পরিণত হয়, কখনো এর ঐতিহ্য সম্পর্কে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে, গুজব ছড়ানোর মধ্য দিয়ে, কখনো এর সম্ভাবনা নিয়ে সুতীব্র নেতিকরণের মধ্য দিয়ে। এর ফলে প্রাচ্যের উন্নয়ন সম্ভাবনা আবশ্যিকভাবেই নির্ভর হয়ে পড়ে পাশ্চাত্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ওপর, কেননা পাশ্চাত্যের উদ্ভাবিত প্রাচ্যবিদ্যা বলছে, স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। আমরা পাশ্চাত্যের সাহায্য ছাড়া এক পা-ও এগোতে অক্ষম। এখানেই আমাদের প্রতি পাশ্চাত্যের সাহায্যের অঙ্গীকার হয়ে দাঁড়ায় এক ধরনের ঔপনিবেশিক অঙ্গীকার (অন্যত্র যাকে বলা হয়েছে 'হোয়াইট ম্যান'স বার্ডেন')। দুঃখের বিষয়, আমরাও এই পাশ্চাত্য ভাষণে আত্মসমর্পণ করে বসে আছি।

নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন সত্তা হয়ে আমরা থাকতে চাই না। সেই সূত্রে পাশ্চাত্যের সঙ্গেও ফলপ্রসূ একটি যোগসম্পর্কে আমাদের যেতে হবে। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের নামে নেহেরু-প্যাটেলের উন্নয়ন ভাবাদর্শ যেমন ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়নি, বিশ্ব বাণিজ্যে অংশ না নিতে চাওয়ার প্রস্তাবও হবে আমাদের জন্য বিপদজ্জনক অবস্থান (স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, নেহেরু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার মনে করতেন)। আমরা ঘরবন্দি হয়ে থাকতে চাই না– 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' প্রবাদকে জাতীয় পর্যায়ে সত্য করে তুলতে চাই। উদারীকরণের খোলা হাওয়া সবকিছুর জন্য রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হওয়ার আমাদের মানসিকতাকে কাটিয়ে উঠার জন্য স্বাস্থ্যকর হবে। অবশ্য আমরা চাই অন্য উদারীকরণ, বিচার-বিবেচনাহীন উদারীকরণ আমাদের জন্য নয়– এ কথা হাল আমলে জেওফ্রি স্যাক্স, ড্যানি রডরিক, পল ক্রুগম্যান থেকে শুরু করে জোসেফ স্টিগলিৎস্ বা তারও আগে ষাটের দশকে আমাদের উন্নয়ন-অর্থনীতিবিদরা, যারা পাকিস্তানের উন্নয়ন মডেলের স্রষ্টা 'হাভার্ড গ্রুপের' সঙ্গে মসীযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন– নূরুল ইসলাম, রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান প্রমুখেরা– অনেক ভাবেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এক কথায়, মধ্যপন্থার রজ্জু বেয়ে প্রায়োগিক উপযোগিতা যাচাই করে করে চলাই হচ্ছে আমাদের জন্য শ্রেয়োতর পন্থা। আমরা বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নকে এড়িয়ে চলতে চাই না, আর তথাকথিত স্বনির্ভর অর্থনীতির অটার্কিতে নিক্ষিপ্ত হতে চাই না। আমরা অর্থনীতির যেকোনো প্রশ্নে পূর্বনির্ধারিত ভাবাদর্শ নয়, প্রায়োগিক উপযোগিতা বিচার করে ও সামাজিক দায়দায়িত্বের অনুজ্ঞাচালিত হয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই। এক্ষেত্রে অনেকেই আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত, তবে নিকটকালে চীন ও ভিয়েতনাম খুব বেশি শিক্ষণীয় উদাহরণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কীভাবে প্রায়োগিক উপযোগিতা বিচার করে অর্থনৈতিক সংস্কারের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, গত দুই দশকের চীন তার প্রমাণ রেখেছে। বাজার ও সরকারি হস্তক্ষেপ, ব্যক্তি খাত, রাষ্ট্রায়ত্ত খাত (ও এনজিও খাত), ব্যক্তিস্বার্থ ও পরার্থপরতা, বিশ্বায়ন ও স্থানীয়করণ, কেন্দ্রায়ন ও বিকেন্দ্রীভবন, ম্যাক্রো ও মাইক্রো, দেশীয় ও আঞ্চলিক (ও উপ-আঞ্চলিক) অর্থশাস্ত্রের যতগুলো প্রয়োজনীয় দ্বৈধতা, ডুয়ালিটি ও ট্রায়ালিটি রয়েছে এর প্রতিটিতেই কোনো পূর্বনির্ধারিত ভাবাদর্শ নয়, প্রায়োগিক বিবেচনা ও সামাজিক দায়দায়িত্ববোধ থেকে অগ্রসর হয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। এখানে অবশ্য এ গুরুত্বপূর্ণ কথাটিও যোগ করা দরকার– সামাজিক দায়দায়িত্ববোধ বলতে মূলত নৈতিক মীমাংসার কথাই বলছি, যেমনটা আমরা পাই জন রাউলসের 'ম্যাক্সি-মিন' নীতিতে (যেখানে বলা হচ্ছে সবচেয়ে বঞ্চিতদের জন্য সর্বাগ্রে প্রাথমিক পণ্য-প্রয়োজন মেটানোর কথা)। এই সামাজিক দায়বদ্ধতা ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের যারা স্থপতি তাদের অনেকের লেখায় পূর্বাপর উপস্থিত ছিল। বাজার অর্থনীতি ধারণার জনক (স্মরণ করুন সেই বিখ্যাত 'অদৃশ্য হাত' তত্ত্ব) এডাম স্মিথের রচনায় প্রবলভাবে নৈতিক মীমাংসার কথা উচ্চারিত হয়েছিল। সে কথা সম্প্রতি এমা রথস্চাইল্ড তার 'ইকনমিক সেন্টিমেন্টস্' বইয়ে আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

৬.

স্বল্পোন্নত দেশের গ্রুপে (বা এলডিসি ক্লাবে) আমাদের থেকে যাওয়া উচিত কিনা– কানকুন সম্মেলনের পরে এ প্রশ্নটি আবারও উঠেছে কারো কারো বক্তব্যে। শর্তাধীন বৈদেশিক সাহায্য নেওয়া উচিত কি না সে প্রশ্নও মাঝে মাঝেই উঠে থাকে। এখানেও চীনের উদহারণ প্রাসঙ্গিক হতে পারে। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চীন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে নিজেকে দাবি করে বিশ্বব্যাংক থেকে অল্প ইন্টারস্টের শর্তাধীন ঋণ (যা আইডিএ ক্রেডিট হিসেবে পরিচিত) পেতে চেয়েছিল। এটা এমন একটা সময়ে যখন চীন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রবৃদ্ধিশীল দেশ হিসেবে প্রায় এক দশকজুড়ে পরিগণিত হয়ে আসছিল এবং দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল নগণ্য চার-পাঁচ শতাংশে। আসল কথা, স্বল্প ইন্টারেস্টের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সহজলভ্য নয় আজকের বিশ্বে। সেটা চীন জানত বলেই সুযোগটা হারাতে চায়নি যত দিন নিতে পারা যায় তত দিন পর্যন্ত। আমরা কেন উন্নয়নের এই স্তরে থেকে খামোখাই সেই সুযোগ হারাতে যাব? অবশ্য আমাদের জন্য এলডিসি ক্লাবে থেকে যাওয়ার উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ কারণ যতটা না বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির তাগিদ, তার চেয়ে য়ুরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে অব্যাহত বাণিজ্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ছাড়পত্র। আমাদের রপ্তানির সিংহভাগ যাচ্ছে উন্নত বিশ্বে, স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ার সুবাদে বাড়তি বাণিজ্য সুবিধা পাওয়ার কারণে।

বিষয়টা শুধু কতটা নমনীয় শর্তে বৈদেশিক সাহায্য পাচ্ছি বা এলডিসি ক্লাবের সদস্য বিধায় কতটা বাড়তি বাণিজ্য সুবিধা পাচ্ছি, তা নিয়ে নয়। মনের দিক থেকে যদি আমরা স্বাধীন হই, তাহলে বৈদেশিক সাহায্যের শর্তও নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হতে পারব। সবটাই নির্ভর করছে বৈদেশিক সাহায্যদাতা বা বৈদেশিক বাণিজ্যের অংশীদারদের সঙ্গে কতটা দক্ষতার সঙ্গে আমরা আমাদের অবস্থান ও অগ্রাধিকারসমূহ তুলে ধরতে পারি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি খাতে 'মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য' পূরণে (যার মধ্যে রয়েছে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যকে অর্ধেক কমিয়ে আনা, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করাসহ ৮টি লক্ষ্য ও ৪৮টি উন্নয়নসূচক) বাড়তি বিনিয়োগের সংস্থান করতে হবে। এবং এর জন্য মিলেনিয়াম লক্ষ্যের অষ্টম লক্ষ্য যেখানে ধনী দেশগুলোর দায়দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে তা আদায়ের জন্য স্বল্পোন্নত বিশ্বসহ আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। বর্ধিত বৈদেশিক সাহায্য, ধনী দেশের বাজারে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও বৈদেশিক দেনার অবমুক্তি– এই তিনটি ক্ষেত্রেই ন্যায্য সুবিধা আদায় করে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এজন্যই চীনের উদাহরণ টেনে প্রায়োগিক বিবেচনাকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়ার প্রাসঙ্গিকতা পরস্পরকে আবারও মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার রয়েছে।

৭.

নব্বই দশকে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হয়েছে এ নিয়ে সন্দেহ নেই। এই দশকে দারিদ্র্য দূরীকরণে অগ্রগতিও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ২০০০-২০০৩ কালপর্বে কৃষিতে প্রকৃত মজুরিও লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। বছরে ১ শতাংশ করে দারিদ্র্যসীমার নিচে জনগোষ্ঠীর হার কমে আসছে এ দেশে। অনেকে এই হারকে নিতান্ত নগণ্য বলেছেন। আংশিকভাবে আমরাও একমত যে, দারিদ্র্য হ্রাসের এই হার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বিস্মৃত হলে চলবে না যে, দারিদ্র্য হ্রাসের বাৎসরিক অগ্রগতির বিচারে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল চতুর্থ স্থানে– চীন, ভিয়েতনাম ও ভারতের পরপরই। ইউএনডিপি-এসকাপ থেকে ২০০৩ সালের মে মাসে প্রকাশিত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস' সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। সাধ ও সাধ্যের সমীকরণে আন্তঃদেশ পরিপ্রেক্ষিতটাও তাই বিবেচনায় নেওয়া দরকার। যেমন দরকার এটাও মনে রাখা যে, স্বাধীনতার পর তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও সত্তর-আশির দশকদ্বয় মূলত গেছে পুরনরুদ্ধার, পুনর্নির্মাণ ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। বস্তুত এক দশকের সামান্য কিছু বেশি সময় কেবল অতিক্রান্ত হয়েছে গণতন্ত্রের পথে। এত স্বল্প সময়ে এ দেশে আরো বড় কিছু করে ফেলা যেত আর্থ-সামাজিক নানা ক্ষেত্রে সেরকম মনে করার খুব বেশি ভিত্তি নেই। য়ুরোপ বা পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতাও সে কথা বলে না। আমাদের জীবনে অনেক অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতা রয়ে গেছে ঠিকই– কিছু কিছু ব্যর্থতা যেমন আইনশৃঙ্খলা ও রাজনীতিতে প্রতিহিংসাপরায়ণতা অত্যন্ত প্রকট কিন্তু বড় বড় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য অর্জনের জন্য আমাদের নিজেদেরই আর কিছুটা বেশি সময় দেওয়া প্রয়োজন। 'গুড মর্নিং বাংলাদেশ' কবিতায় শামসুর রাহমান এক দশকেরও আগে লিখেছিলেন : উন্নয়ন বিশারদগণ পাঁচসালা পরিকল্পনাকে/কুরে কুরে খাচ্ছেন ঘুণের ধরনে।' ঘুণপোকারা তার নানা কবিতায় কুরে কুরে খায় 'রাষ্ট্রের কাঠামো, অবকাঠামো'। দেশকে আগামী এক দশকের জন্য এগিয়ে নিতে এ ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদ, সমাজ-বিজ্ঞানী, সমাজমনস্ক ব্যক্তিদের আরো কিছু বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ■

বিনায়ক সেন : অর্থনীতিবিদ